সূর্যের দূরত্ব কীভাবে জানলাম?

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

সূর্য পৃথিবী থেকে কত দূরে আছে? বর্তমানে খুবই সরল প্রশ্ন। বর্তমানে আমরা এই দূরত্ব শুধু জানিই না, এটাকে দূরত্বের একক হিসেবেও ব্যবহার করি। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্বের নাম এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা এইউ। তবে এই জিনিসটাই জ্যোতির্বিদদের ধাঁধাঁয় ফেলে রেখেছিল দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে।   
  
প্রাচীন গ্রিসের চিন্তাবিদরাই প্রথম মহাবিশ্বের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দাঁড় করানোর চেষ্টা করে৷ তাদের কাছে হাতিয়ার বলতে ছিল কেবল খালি চোখ৷ ছিল না কোনো যন্ত্রপাতি৷ খালি চোখেই অবশ্য বেশ কিছু ব্যাপার বোঝা যায়৷ চাঁদকে আকাশে বেশ বড় দেখায়৷ ফলে এর অবস্থানও কাছে হবেই বলে অনুমান করা হয়৷ সূর্যগ্রহণ থেকে দেখা গেল, পৃথিবীর আকাশে চাঁদ ও সূর্যের আকার প্রায় সমান। কিন্ত সূর্য চাঁদের তুলনায় অনেক অনেক উজ্জ্বল৷ তাহলে হয়তোবা সূর্য আসলে অনেক বড়, কিন্তু অবস্থান দূরে৷ খালি চোখে দেখা যায় পাঁচটি গ্রহ৷ এদেরকেও প্রায় তারার সমান দেখায়৷ তবে এদের গতিপ্রকৃতি ভিন্ন এবং দ্রুত৷ এরা হয়তো তাহলে তারা ও সূর্যের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় আছে৷   
  
এলোমেলো এ চিন্তাগুলো থেকে সঠিক দূরত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। জ্যামিতির আবিষ্কার সে কাজটা সহজ করে দিল৷ সর্বপ্রথম দূরত্ব পরিমাপ করা হয় চাঁদের। এটা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা৷ গ্রিক জ্যোতির্বিদ হিপারকাস প্যারালাক্স বা লম্বন পদ্ধতির ব্যবহার চালু করেন। প্যারালাক্সের ধারণাটা খুব সরল। ভিন্ন জায়গা থেকে একই বস্তুকে দেখলে অবস্থান পাল্টে যায় বলে মনে হয়। চোখের সামনে আঙ্গুল রেখেই এটা পরীক্ষা করে ফেলা যায়। এক চোখ বন্ধ করে চোখের সামনে আঙ্গুল ধরে দেখুন। আবার কাজটা করুন অন্য চোখ বন্ধ করে। দেখবেন, আঙ্গুলের অবস্থান পাল্টে যাচ্ছে। বস্তুর দূরত্ব বেশি হলে দুই অবস্থানের পার্থক্য বা কৌণিক দূরত্ব কমে যাবে৷ আর তা থেকে জ্যামিতিক উপায়ে বের করা যাবে বস্তুটার দূরত্ব৷   
  
চাঁদের দূরত্ব এভাবেই বের করা হয়৷ হিপারকাস দুই আলাদা শহর থেকে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করেন৷ এরপর খুব সরল জ্যামিতি কাজে লাগিয়ে বের করেন দূরত্ব৷ সে দূরত্বের সাথে আধুনিক পরিমাপের পার্থক্য মাত্র ৭ ভাগ৷ তাঁর বলে রাখা ভাল, হিপারকাস ছিলেন জ্যামিতির প্রতিষ্ঠাতাও৷ কী বিশাল দূরের জিনিস সহজে করায়ত্ত হয়ে গেল৷ আসলেই মহাবিশ্ব এক ধাঁধাঁ৷ আর সে ধাঁধাঁ সমাধানের সূত্র ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে৷

এরপর দৃশ্যপটে আসেন আরেক গ্রিক জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টার্কাস৷ তিনি সূর্যের দূরত্ব মাপার অভিযানে নামলেন৷ তা করতে গিয়েই দারুণ একটি জিনিস খেয়াল করলেন। চাঁদ অর্ধেক আলোকিত থাকার সময় পৃথিবী ও সূর্যের সাথে সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করে৷ চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব আগেই জানা। এখন পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব জানতে হলে পৃথিবীর চাঁদ ও সূর্যের মধ্যকার কোণ জানা চাই৷ এত দারুণ এ কৌশল মার খেয়ে যায় পর্যবেক্ষণের হাতিয়ারের অভাবে৷ খালি চোখ ছাড়া যে পর্যবেক্ষণের কোনো উপায় নেই! তার ওপর সূর্য অনেক দূরে অবস্থিত বলে কাঙ্খিত এ কোণের মানও প্রায় ৯০ ডিগ্রি। ফলে নিখুঁত করে মাপতে পাড়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। অ্যারিস্টার্কাস তাও থেমে থাকলেন না। তাঁর হিসাবে এ কোণের মান পেলেন ৮৭ ডিগ্রি৷ হিসাবটাকে ভাল না বলে উপায় নেই৷ সত্যিকার মান প্রায় ৮৯.৮৫৩ ডিগ্রি৷ তবে বড় দূরত্বের ক্ষেত্রে এটুকু ব্যবধানই বিশাল পার্থক্য গড়ে দেয়৷ অ্যারিস্টার্কাসের পাওয়া মানে তাই সত্যিকার পরিমাপ থেকে ছিল এক হাজার গুনের বেশি ব্যবধান।

চিত্র ১

পৃথিবীতে উৎপন্ন সূর্য ও চাঁদের কোণ

https://github.com/mahmudstat/articles/blob/main/books/sun/img/sun\_moon\_angle.png?raw=true

চিত্র ১-এর সাথে মিলিয়ে এ দূরত্ব এখন আমরাও বের করতে পারি। ব্যবহার করতে হবে ত্রিকোণমিতিক কোণ কস (cos)। cos-এর মান পাওয়া যায় সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজকে ভূমি দিয়ে ভাগ দিয়ে। এখানে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব অতিভুজ (c)। আর θ কোণের জন্য পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব (a) হলো ত্রিভুজের ভূমি। তাহলে cosθ = a/c। অ্যারিস্টার্কাসের θ-এর মান ছিল ৮৭ ডিগ্রি। চাঁদের জানা দূরত্ব ছিল ৪ লক্ষ কিলোমিটার (যা আসলে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার)। ৪ লক্ষকে cos(87) দিয়ে ভাগ দিলেই অ্যারিস্টার্কাসের সূর্যের দূরত্ব পেয়ে যাব আমরা। cos(87)-এর মান ক্যালকুলেটর চাপলেই মিলবে ০.০৫২৩। কোণ ও চাঁদের দূরত্বের সঠিক মান ব্যবহার করলেই বর্তমান মানটাও পাওয়া যাবে।

দূরত্ব নির্ভুল না হলেও অ্যারিস্টার্কাস এ পরিমাপ থেকে অসাধারণ এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেন৷ পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের তুলনামূলক দূরত্ব থেকে তিনি ধরে নেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে৷ নিকোলাস কোপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রিক মডেল প্রকাশ করার ১৭০০ বছর আগেই সেটা বুঝতে পারেন তিনি৷   
  
১৬৫৩ সালে ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স সূর্যের দূরত্ব মাপেন শুক্র গ্রহের দশা কাজে লাগিয়ে। কৌশলটা অ্যারিস্টার্কাসের মতোই। চাঁদের বদলে শুক্র--এই। অ্যারিস্টার্কাসের চেয়ে এ পরিমাপ বেশি নির্ভুল ছিল। কারণ ততদিনে টেলিস্কোপের আবিষ্কার আকাশ পর্যবেক্ষণকে সহজ করে দিয়েছে৷ তবে তাঁর এ পদ্ধতিতে শুক্রের আকার অনুমান করে নিতে হয়েছিল। অনুমান পরে সঠিক প্রমাণিত হলেও পদ্ধতিটাকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। এ কারণে তাঁকে এ কাজের জন্য কৃতিত্বও দেওয়া হয় না।   
  
১৬৭২ সালে জোভানি কাসিনি প্যারালাক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব মাপেন। প্যারালাক্সের জন্য আলাদা অবস্থান থেকে পরিমাপ নিতে হবে। বন্ধু জঁ রিচেকে পাঠিয়ে দিলেন ফ্রেঞ্চ গায়ানার কেইয়েন শহরে। নিজে থাকলেন প্যারিসে। দুজনে একইসময়ে দূরবর্তী পটভূমি তারার সাপেক্ষে মঙ্গলের অবস্থান দেখলেন। দুই শহরে দূরত্ব জানা। হিসাব কষে বের করে ফেললেন মঙ্গলের দূরত্ব। ততদিনে সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের আপেক্ষিক দূরত্বের অনুপাত জানা হয়ে গিয়েছিল। সূর্যের দূরত্ব বের করতে তাই পৃথিবী থেকে যেকোনো একটি গ্রহের দূরত্ব বের করলেই হত। সেটাই কাসিনি করে ফেললেন। কাসিনির মাপা সূর্যের দূরত্ব ছিল ১৩.৮ কোটি কিলোমিটার (প্রকৃত মান প্রায় ১৫ কোটি)।

নিশ্চয়ই ভাবছেন, চাঁদের ক্ষেত্রে করা গেলে সূর্যের ক্ষেত্রে কেন প্যারালাক্স পদ্ধতি সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি। প্যারালাক্স দিয়ে সূর্যের দূরত্ব মাপা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রথমত সূর্য দেখতে বৈশিষ্ট্যহীন। তার ওপর এর অতিঔজ্জ্বল্য এর আশেপাশে ও পেছনে থাকা তারকাদেরকে উধাও করে দেয়। পটভূমির এ তারকাগুলো দেখা না গেলে প্যারালাক্সের কোণের পরিবর্তন মাপা যায় না। কোণের পরিবর্তন বুঝতে হলে পটভূমি থাকা চাই।   
  
তবে গ্রহদের অতিক্রমণ কাজে লাগিয়েও সূর্যের প্যারালাক্স বের করা যায়। অতিক্রমণের সময় পৃথিবী থেকে দেখতে গ্রহরা নক্ষত্রের (এক্ষেত্রে সূর্য) সামনে চলে আসে। সূর্যের গায়ে দেখা যায় কালো বিন্দুর মতো। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এ অতিক্রমণ দেখতে হবে আলাদা৷ কোথাও ছোট বিন্দু, কোথাও বা বড়।জেমস গ্রেগোরি বুধ গ্রহের অতিক্রমণের মাধ্যমে প্যারালাক্স বের করার কথা ভাবেন। তবে এডমান্ড হ্যালি দেখালেন, শুক্র গ্রহ দিয়ে কাজটা আরও নির্ভুলভাবে হবে।

চিত্র ২ – অতিক্রমণ]

https://github.com/mahmudstat/articles/blob/main/books/sun/img/venus\_transit.png?raw=true

কিন্তু শুক্র গ্রহের অতিক্রমণ অনেক দুর্লভ ঘটনা৷ জীবনে একবার পাওয়ার মতো। যদিও অতিক্রমণ জোড়ায় জোড়ায় ঘটে৷ এক শ বছরের বেশি সময় পর দুইবার হয়। কাছাকাছি দুই অতিক্রমণের মধ্যে সময়ের পার্থক্য দশ বছরের কম। হ্যালি বুঝতে পারলেন, এ পদ্ধতিতে দূরত্বটা বের করা যাবে। তবে এও বুঝলেন, পরবর্তী অতিক্রমণ পর্যন্ত নিজে বেঁচে থাকবেন না। (সেটাই হয়েছিল। পরবর্তী অতিক্রমণ হয় ১৭৬১ সালে। তাঁর মৃত্যু ১৭৪২ সালে।) তাই ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য একদম নিখুঁত করে নির্দেশনা লিখে গেলেন৷ পর্যবেক্ষণ করার খুটিনাটি কৌশল বলে দিলেন। ফলাফলকে কাঙ্খিত মানের নির্ভুল করতে অতিক্রমণের সময়টা কয়েক সেকেন্ডও এদিক-সেদিক হতে পারবে না। পর্যবেক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়গুলোর দূরত্ব হতে হবে বিশাল৷ মেঘ যাতে পরীক্ষাটাকে নষ্ট করে দিতে না পারে, সেজন্য সারাবিশ্বের বিভিন্ন বিকল্প স্থান থেকে কাজটা করতে হবে৷ এমন এক সময়ের কথা বলছি, যখন এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে যেতে কয়েক বছর লেগে যেত৷   
  
এতসব বাধার মুখেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের জ্যোতির্বিদরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। ১৭৬১ সালের অতিক্রমণ ঘিরে পরিকল্পনা সাজালেন৷ কিন্তু এর মধ্যেই ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল৷ বিখ্যাত সেভেন ইয়ারস ওয়ার। সমুদ্র পথে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব হয়ে গেল৷ কিন্তু অদম্য ইচ্ছার কাছে সবকিছু হার মানল। সব জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হলো না। কোথাও বাধা হলো মেঘ, কোথাও বা যুদ্ধজাহাজ। তবুও কিছু পর্যবেক্ষণ হলো। ৮ বছর পরে (১৭৬৯) হলো আরেকটি অতিক্রমণ। দুই অতিক্রমণের উপাত্ত মিলিয়ে ভালো রসদের যোগান হলো।   
  
সব উপাত্ত মিলিয়ে সূর্যের দূরত্বটা বের করলেন ফরাসি জ্যোতির্বিদ জিরোম লালাঁন্ড। মান পেলেন ১৫.৩ কোটি কিলোমিটার। যা প্রকৃত মানের ৩% মাত্র এদিক-ওদিক।   
  
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের কথা ভাবলেই মনে রাখতে হবে, সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর (বা অন্য গ্রহের) কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। দূরত্ব তাই বাড়ে-কমে। আমরা সাধারণত যে দূরত্বের কথা বলি তা হলো গড় দূরত্ব৷ ফলে এক বছরে এমনিতেও গড় মানের ৩% এদিক-সেদিক ওঠানামা হয়। গড় দূরত্বটাই বর্তমানে এক এইউ (AU) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বর্তমান মান ১৪.৯ কোটি কিলোমিটারের কাছাকাছি৷   
  
সূর্যের দূরত্ব জানার মাধ্যমে আরও দূরের নক্ষত্রের দূরত্ব জানার পথও উন্মুক্ত হয়ে গেল। একবার ভাবুন তো কীভাবে পথ খুলল?   
  
আগেই বলেছি, দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে প্যারালাক্সের কোণ ছোট হবে। নক্ষত্রের মতো বিশাল দূরের জিনিস তো প্যারালাক্সকে দামই দেয় না। দূরের দুই শহর থেকে দেখলেও কৌণিক পার্থক্য চোখে পড়ার মতো হবে না। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টোরির প্যারালাক্স কেমন হবে দেখা যাক। একটু দৃশ্যমান ব্যবধান পেতে পৃথিবীর একদম দুই প্রান্তে দুই টেলিস্কোপ বসিয়ে দেখতে পারেন। তাতেও প্যারালাক্সের মান আসবে প্রায় ০.০৬৫ আর্কসেকেন্ড। যা এক ডিগ্রির ৫৫ হাজার ভাগের এক ভাগ! এত ক্ষুদ্র মান পৃথিবীতে বসে মাপা প্রায় অসম্ভব।

সমস্যাটার আরও সহজ সমাধান আছে সূর্যের দূরত্বের মধ্যেই। পৃথিবী এক বছরে সূর্যকে একবার ঘুরে আসে। কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। তার মানে, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরতে গিয়ে নিজের অবস্থান থেকে ২ এইউ পর্যন্ত সরে আসে৷ কক্ষপথের দুই বিপরীত অবস্থান থেকে কোনো তারকাকে দেখলেই প্যারালাক্সের কোণের ভাল মান পাওয়া যাবে। একবার ভাবুন, পৃথিবীর দুই পাশ থেকে দেখার তুলনায় কত বিশাল দূরত্বের ব্যবধান থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে। পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ১২,৭৪২ কিলোমিটার। আর সেখানে কক্ষপথের বিপরীত বিন্দুর সর্বোচ্চ দূরত্ব প্রায় ১৫.২ কোটি কিলোমিটার৷   
  
হিসাবটাও সোজা। প্যারালাক্স থেকে প্রাপ্ত কোণের বিপরীত সংখ্যাই দূরত্ব। মানে কোণ দিয়ে ১-কে ভাগ দিতে হবে। কোণের একক হবে আর্কসেকেন্ড৷ এক ডিগ্রিকে ৬০ ভাগ করলে হয় ১ আর্কমিনিট। ৬০ দিয়ে আবারও ভাগ করলে হয় আর্কসেকেন্ড৷ এবার একটা সরল হিসাব করি। সূর্যের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টোরি। এর প্যারালাক্স ০.৭৬৮ আর্কসেকেন্ড। তাহলে এর দূরত্ব ১/০.৭৬৮ = ১.৩ পারসেক। দূরত্বের এ এককটাই জ্যোতির্বিদরা ব্যবহার করেন। একে আলোকবর্ষ বানাতে ৩.২৬ দিয়ে গুণ করুন। পাওয়া যাবে ৪.২৪ আলোকবর্ষ৷

দূরের নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্যারালাক্সের মান অনেক ছোট হয়ে আসে। যন্ত্রের আধুনিকায়ন সে ক্ষুদ্র দূরত্বকেও নিয়ে আসে হাতের নাগালে। এই যেমন হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। এর ওয়াইড ফিল্ড ক্যামেরা থ্রি ৪০ মাইক্রোআর্কসেকেন্ড কোণও মাপতে পারে। পরিমাণটা এক ডিগ্রির ৩৬০ কোটি ভাগের এক ভাগ। দূরত্ব মাপা যায় ১৬ হাজার আলোকবর্ষ পর্যন্ত। এভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হাত ধরাধরি করে মহাবিশ্বের ধাঁধাঁ সমাধান করতে সাহায্য করে যায় মানুষকে৷ আরও বড় দূরত্ব মাপারও কায়দা আছে। সে গল্পটা তোলা থাকল।

সূত্র: স্পেস ডট কম, ফিজ ডট অর্গ, ইউনিভার্সিটি অব অ্যালবার্টা ওয়েবসাইট

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ

<https://www.space.com/17081-how-far-is-earth-from-the-sun.html>  
  
<https://phys.org/news/2015-01-distance-sun.html>

<https://sites.ualberta.ca/~pogosyan/teaching/ASTRO_122/lect11/lecture11.html>

https://www.minerva.ufsc.br/~kanaan/intastro/lecture1/www.astro.washington.edu/labs/eratosthenes/rung3.html